বড়দের কচুরিপানা

তসলিমা নাসরিন

ক. ভাষায় যেটুকু বলা যায় /বিজয়া মুখোপাধ্যায় খ. রাত্রি তখন কথকতা /শ্বেতা চক্রবর্তী গ.সাত মিনিট ঝড়/পিনাকী ঠাকুর ঘ.যদিও সামান্যতর /তিলোত্তমা মজুমদার ঙ.ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে /মল্লিকা সেনগুপ্ত ঙ.মণিপুরের মা/সুবোধ সরকার চ.দাঁড়াচ্ছি দরজার বাইরে/ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় জ.ছোটদের চিড়িয়াখানা /শ্রীজাত

আটটি কবিতার বই। আটজন কবি। আট জন কবির কবিতা আট রকম। আটটি বিস্ময়, কোনওটি বিমূঢ় করে, কোনওটি বিরূপ করে।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় যেটুকু বলা যায় -- বইটির কবিতাগুলো পাকা হাতের লেখা। ব্যক্তিগত অনেক বন্ধুর কথা কবি লিখেছেন, একান্ত ব্যক্তিগত হলেও পড়তে চমৎকার। এই হল পাকা হাতের গুণ। ঘরের আনাচ কানাচে হাঁটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ পিঁপড়ে নিয়ে লিখলেও সেটি অসাধারণ কবিতা হয়ে উঠতে পারে। পিঁপড়ে ঘরের সব কিছু দখল করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে, পিঁপড়ে এমনকী মোবাইল ফোনে, ক্যাসেটের ফাঁকে, টেবিল বাতির নীচে, জলের গেলাসে। বিজয়া পিঁপড়েকে মিনতি করে বলছেন,

চশমার হাতল থেকে শুধু একটু দূরে/
থাকো তো বাধিত হই, ওগো পিঁপড়ে সোনা/
ও দুটি আমারই থাক, আর সব ছেড়েছি/
রাত্রে কিছু লেখালেখি -- সেটুকু পারব না?/

টুলি, টুকাই, সুহাস, এমিলো, অভ্রদীপ, ক্যারোলিন, সুভাষদা, সুনীল সকলকে নিয়েই কবিতা লিখেছেন বিজয়া। সুনীলের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়, সুনীলের কবিতাকে পড়তে পড়তে মাত্রায় বসানো, অক্ষরবৃত্তে নিজের কবিতা লেখা, সুনীলের ধমক খাওয়া, নেশাগ্রস্ত কবিদের সামনে বিজয়ার হাই তোলা ইত্যাদি কথা স্মরণ করে কবির বয়েস নেই বলে অনবদ্য একটি কবিতা লিখে ফেলেছেন। বহুকালের বিরোধের পর আপোসের বাণী বিজয়ার কণ্ঠে,

সুনীল সত্তরে, তাতে কী বা এসে যায়,/
সুনীল সুনীল থাক, মধ্যমণি বাংলা কবিতার।

আপোসের কবিতা যেমন চমৎকার, তেমনি চমৎকার অভিমানের কবিতাটিও, লিখতে-লিখতে লিখতে-লিখতে। মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি নিয়ে লেখা কবিতাটির একটি অংশ এরকম,

.....আপনি মন পাননি যাঁর/

জানতেন তো তাঁকে। আপনার চিঠির তোড়া কে হারাল/

সে কি আমরা--কেমন হাতের লেখা, মনোভঙ্গি, মান/

ধরা পড়বে বলে তারা কোন পথে হল নিরুদ্দেশ?

প্রচ্ছন্ন কিছু কথা আছে নারীর বেদনা নিয়ে।

একশো পুরুষে মেয়ে তিরানব্বুই,/

সমস্যাগুলি পাশে রেখে ফিরে শুই।/

এরকম পংক্তি পড়ে হঠাৎ হঠাৎ মনে হতে পারে, বিজয়া বুঝি নারীবাদী। কিন্তু তিনি কোনও একটি নির্দিষ্ট বাদে বা প্রতিবাদে, কোনও একটি বিষয়ে বা বস্তুতে স্থির থাকেননি। তাঁর অগুনতি বিষয় আশয়। ব্যক্তিগত থেকে সমস্টিগততে পৌঁছে যান নিমেষেই।

মানুষ ঈর্ষা করে করে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। থাকতে চায়/

প্রতিপক্ষহীন। থাকতে চায় আঁটোসাঁটো আর লম্বা। এত/

লম্বা, যাতে অন্য কেউ ছুঁতে না পারে তার মাথা, মাথার/

চুল, চুলের ডগা। সব প্রজাতির বিনিময়ে সে চায় আয়ু।/

ভোগ্যস্তূপের মাঝখানে তার দীর্ঘ বেঁচে থাকার,/

একাকিত্বের অন্যায় সুবিধে।

এক ঊনবিংশতিকে বিজয়া অনেক কিছু দিয়ে যাচ্ছেন। দিতে গিয়ে লিখেছেন,

অবভৃথস্নানে এবার প্রসন্নতা/

তোকে দিয়ে যাব এক মাঠ স্বাধীনতা/

প্রথম দৌড়ে পা ফেটে রক্তে যদি/

ভেজে মৃত্তিকা, শুষে নিয়ে হব নদী।/

বিজয়াকে নদীর মতো মনে হয়। একটি দীর্ঘ শান্ত স্নিগ্ধ নদী। যার পাড়ে বসে থেকে, যার শীতল স্রোতের শব্দের সঙ্গে নিজের গোপন শব্দগুচ্ছকে একাকার করা যায়।

বিজয়ার মতো মৃণালিনীকে নিয়ে সুন্দর একটি কবিতা লিখেছেন শ্বেতা চক্রবর্তী। চারণী নাম কবিতাটির।

আমিও তো খুব ক্লান্ত, ঠাকুর, আমায় নিয়েও একটা/

উপন্যাস লেখা যায় না? একখানা প্রেমের কবিতা?/

হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলের মতো অনবদ্য প্রেমের কবিতা?/

চরণচারণী শুধু, আমায় কে দেখে অন্ধকারে?/

শ্বেতা চক্রবর্তীর কবিতায় দুর্বিনীত দুঃসাহস আছে, শরীরী প্রেম আছে, বীর্যরসের উৎসব আছে, প্রচণ্ড প্রাণের প্রতাপ আছে যেসব সাধারণত নারী-কবিদের কবিতায় দেখা যায় না। তাঁর কবিতা খুব সরল, স্বচ্ছ, সহজ আর সৎ। খুব অকপট।

যে প্রেমিক শরীরে আসেনি, তাকে আমি প্রেমিক বলি না।

নীলা কবিতাটি খুব সুন্দর। যে কোনও মূল্যেই পুরুষ চাই তাঁর। যৌনানন্দ চাই।

সমস্ত পুরুষ ঘেঁটে যদি একজন প্রেমিক পেতাম/

যত বিষই থাক তার/

দুধকলা দিয়ে পুষতাম।/

প্রেমিক গিয়েছে চলে, যেটুকু দেবার তাই দিয়ে। প্রেমিকের বিষে নীল হয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখে সকলে প্রশ্ন করছে,

বিয়ে কবে হয়েছিল? সকলের চোখে প্রশ্ন --হু! /

নীলা সয় না সকলের, নীলার কি সকলকে সয়!/

যে নারী তার শরীরের স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারে, সে নারী সত্যিকার স্বাধীন নয়, এ কথা সত্য। কিন্তু শরীরী স্বাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গেলে জগত থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সতীত্ব-নীতির নিতম্বে আঘাত করা হল ঠিকই, কিন্তু আরও তো অনেক জগদ্দল পাথর আছে সরাবার, আরও প্রতিবন্ধকতার গায়ে, আরও সংস্কারের শরীরে আঘাত করে করে না এগোলে নারী প্রেমিকা হিসেবে তার অধিকার পেতে পারে হয়তো, কিন্তু মানুষ হিসেবে নয়। পুরুষের ওপর নিজের যাবতীয় আনন্দের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে পুরুষকে মহামানব বানিয়ে ভগবান বানিয়ে পুরুষতান্ত্রিক প্রথাকেই একরকম তেল ঘি মাখিয়ে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য অনেকের থাকে। শ্বেতার যদি তা না থাকে, তবে শরীর ছেড়ে তিনি নিশ্চয়ই একদিন উঠে দাঁড়াবেন-- তাঁর সবল শব্দগুচ্ছ নিয়ে তিনি সেইসব জটিল এবং জটিলতর পথে যাবেন, যে পথে সাহস নেই সবার যাবার।

সাহস আছে পিনাকী ঠাকুরের, যেখানে খুশি সেখানে যাবার। যা ইচ্ছে তাই করার। চমকে দেন তিনি। জোরে ধাককা মেরে জাগিয়ে দেন, টনক নড়িয়ে দেন। টগবগ করা জীবন তাঁর হাতের মুঠোয়, তাঁর সাত মিনিট ঝড়ে। কবিতা তো নয়, যেন পিনাকী সামনে বসে দুদ্দাড় বকে যাচ্ছেন। বিস্মিত হতে হতে শুনে যাচ্ছি তাঁকে। জাদুকরের মতো তাক লাকিয়ে দিচ্ছেন। আহ, বাংলা কবিতাকে এত ইংরেজি শব্দে মুড়ে বিদঘুটে বানাচ্ছো কেন ! মনে মনে বলি। কিন্তু পরক্ষণে নিজের অভিযোগটুকু গিলে ফেলি নিঃশব্দে। পিনাকী তো তাঁর এবং তাঁর চারপাশের জীবনকে বলছেন। যদি জীবন এমনই হয়, যদি বিবর্তন এমনই এক বাস্তবতার সামনে আমাদের দাঁড় করায়, তবে কবি-পিনাকী বা মানুষ-পিনাকী তো চোখ বুজে থাকতে পারেন না, রাবিন্দ্রিক ভাষায় আধুনিক কাব্য লিখে তো মিথ্যাচার করতে পারেন না! সাত মিনিট ঝড় দিয়ে শুরু হল কবিতা, পাঠককে ডুবিয়ে ভাসিয়ে একাকার করে দিল পিনাকীর তুখোড় শব্দাবলী, শেষ কবিতা অক্ষরুদ্দিন খোদাইকরকে ভরসা করে তবেই পাঠকের পাড়ে ওঠা। পংক্তি চাই ? স্তবক চাই ? না, থাক। ঝড় তোলা শব্দগুলো তুলে দেখাতে গেলে ঘর বারান্দা ভেসে যাবে।

না, পিনাকীর মতো প্রতিভা কম কবিরই আছে। তিলোত্তমা মজুমদার মূলত গদ্য লেখেন। কবিতাও লিখেছেন। তিলোত্তমা তাঁর নিজের মতো করে আধুনিক। পিনাকীর কবিতা পড়ার পর তিলোত্তমার কবিতা পড়লে হঠাৎ মনে হতে পারে যেন এক ঝটকায় দু দশক পিছনে

চলে গেছে সময়। কিন্তু না, মন দিয়ে দেখলে এক তরুণী-জীবননান্দকে আবছা আবছা দেখা যায়। শীতের হাওয়ায় একধরনের হা হা শব্দ বাজে। আমাদের বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে হাওয়া এলে জড়িয়ে যায় জলকণা। আর কেউ-ই বুঝতে পারে না কিছু। শুধু আমি, একলা একলা, ঘুমন্ত জলপিপিদের ডানাঝাড়ার শব্দ পাই। হাঁসেদের সন্দিগ্ধ হাঁকডাক শ্যাওলার অতীত থেকে উঠে আসতে থাকে। কখন কীভাবে শিখলাম মাঝরাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকার মন্ত্র-- তোমার সঙ্গে আমার আজকাল মাঝরাত্রে দেখা হয়। এই গদ্যটুকু তোমার সঙ্গে আজকাল নামের পদ্য থেকে নেওয়া। চিঠি, মেঘ আদেশ করো, যদিও সামান্যতর নামে তিনি যা লিখেছেন, সবই টানা গদ্য। গদ্যগুলোকে নিশ্চয়ই তিলোত্তমা পদ্য বা কবিতা বলছেন। লেখকের স্বাধীনতা আছে তাঁর রচনাকে যা কিছু নাম দেওয়ার। আমি পাঠক হিসেবে সেই যা কিছুকে যে কোনও নামের মোড়কেই সে থাকুক, যদি আমাকে স্পর্শ করতে পারে, নির্দ্বিধায় গ্রহণ করি। পুরো বই পড়ে ওঠার পর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও ভঙ্গিমার, বিষয় আর বৈচিত্রের প্রশংসা করা হল, এবং যদিও সামান্য নয় তিলোত্তমার পদ্য বা গদ্য, তবুও কেন জানি, সত্য কথা এই যে, বড় পর পর লাগে।

চারদিকে যদি শুধু কৃত্রিমতা, শুধু লোক দেখানো, শুধু সিঁড়ি পেরোনো, হন্যে হয়ে ওপরে ওঠা, ওপরের ঝলমলে শূন্যতাকে ছুঁতে মারামারি, শুধু হাওয়াই মিঠাই, শুধু ইঁদুর খেলা, সিঁদুর খেলা, তবে যাই কোথায় ! ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়, তাই ভয়ে ভয়ে চোখের সামনে মেলে ধরি ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, তার কবিতা। কবিতাটির শেষে মন্তব্য করেছেন মল্লিকা, আসলে হিজরে ছিল ইতিহাসবিদ। এই কবিতাটিকে নারীবাদী কবিতা বলবো ? বলবো। নারীবাদের এমন আকালে তো বলবোই, আজকাল যখন নারী-লেখক-কবিরা ফাঁক পেলেই সভয়ে সরোষে সস্নেহে শুধরে দেন সব্বাইকে, এই আস্থা দেন এই সান্ত্বনা যে তাঁরা নারীবাদী নন। এই আকালে দুচারটে কবিতা কেউ যখন নারীর জন্য লিখে ফেলেন, তখন বাহবা দিতেই হয়। কিন্তু এ বইয়ের নারীবাদ বড্ড বেশি শরীর-সর্বস্ব। বিপুল শরীর হাঁসফাঁস করে বিপুল শরীর লাগি।

শরীর শরীর চায়, মন চায় শরীরের মন/
শরীর শরীর চায় নোনা মিঠে তেতো ও কষায়/
শরীর শরীর চায় আলিঙ্গন, প্রগাঢ় সংযোগ/
শরীর শরীর চায় শীত গ্রীস্ম বসন্ত বর্ষায়/

বিজয়া আর শ্বেতার মতো মল্লিকাও লিখেছেন মৃণালিনীকে নিয়ে কবিতা, মৃণালিনী কোলাজ। তবে মল্লিকার মৃণালিনী সুখী গৃহবধূ। অন্যরা মৃণালিনীর একাকীত্বকে, যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে কষ্ট পেয়েছেন, মল্লিকা পাননি। না পাওয়ার স্বাধীনতা তাঁর নিশ্চয়ই আছে। তবে মল্লিকা কষ্ট পেয়েছেন মণিপুরের নগ্ন মিছিল দেখে। বইটিতে অনেকবারই এর উল্লেখ আছে। একটি কবিতার নাম আমার কবিতা আগুনের খোঁজে, সেখানে লিখেছেন, আমার কবিতা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। ওদিকে আবার তাঁর আমার দুর্গা কবিতাতেও আছে, আমার দুর্গা

মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। তাঁর কবিতা তাঁর দুর্গা, তাঁর দেবী। ক্ষিপ্ত হয়ে স্লোগান দিচ্ছেন দেবী,

জ্বলব নিজে, জ্বালিয়ে দেব মুখোশ শান্তির/

ছুড়ব ধর্ষকের দিকে বিষমাখানো তির/..

আমার প্রতিবাদের ভাষা নগ্নতা নগ্নতা/

মণিপুরের আগুনে আমি জ্বালব কলকাতা।/

দেবী বটে, তবে এই দেবীর রূপ সবসময় শোভন নয়, দেবী খামোকাই খিস্তি করেন। ইংরেজি হিন্দি শব্দ মিশিয়ে কবিতা লিখে দেবী আধুনিক কবি হতে চান। গায়ে রঙিন পালক গুঁজে কিছু একটা সাজা যায়, কিন্তু দু কদম সামনে এগোলেই পালক খসে পড়ে । পালক খসে খক্ষড়. বাংরভড়ব এর আত্মবিলোপ-এ, গুরুচণ্ডালিতে, চিঠিতে। দেবী কখনও নারীর পক্ষে সওয়াল করেছেন, কখনও ইরাকের যুদ্ধকে দোষ দিয়েছেন। বিষয় খুব ভালো। কিন্তু অল্পবোধ স্বল্পশিল্প ভয়ঙ্করী রূপে দেখা দেয় এভাবে, পর্দা ঢাকা যে মেয়েকে সূর্যও চেনে না/ যুদ্ধ শেষে তাকে নিয়ে লোফালুফি পরদেশি সেনা। দুর্গার সমস্যা এই, বিসর্জনের দিন এসে গেলেও দুর্গা গাল ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে কাগজ কলম কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মণিপুরের আগুন ছড়িয়ে গেছে সংসারে। সুবোধ সরকারের বইয়ের নাম মণিপুরের মা। মণিপুরের নগ্ন মেয়েদের ছবি দেখে আর সবার মতো সুবোধ সরকারও আলোড়িত, তাই বইয়ের নাম তো রেখেছেনই, বেশ কটি কবিতাও লিখে ফেলেছেন মণিপুরের মেয়ে আর মা নিয়ে। কেবল মণিপুরের নয়, তাঁর অনার্স ক্লাসের মেয়ে, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে, এ বাড়ির মা, ও বাড়ির মেয়ে, শ্যামা মা এঁরাও তাঁর বিষয়। অনার্স ক্লাসের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চান, কিন্তু লোকে সাড়ে আটত্রিশ ভাজা করে দেবে বলে একটুখানি ভয় পাচ্ছেন। তবে ভীতু হলে কী হবে, ফাঁক মতো পুরুষাঙ্গের প্রশস্তি গেয়েছেন পুরুষতন্ত্রের প্রতিভু।

এত অঙ্গ আছে তবু পুরুষাঙ্গ ছাড়া/

ঈশ্বর ঈশ্বর নয়, সেও দিশাহারা। ..আমি শিশ্ন, আমি লিঙ্গ, আমি জনপদ,/

আমি ওই ব্রহ্মতালু স্পর্শ করা মদ ..।/

লিঙ্গ, পুলিশ, মিলিটারি, ভগবান, সোনাগাছি, হুক, গোল স্তন, জঙ্ঘা এই শব্দগুলো সুবোধের কবিতায় বারবার আসে। শব্দগুলোই বুঝিয়ে দেয় কবিতা কোন বিষয় কোন বস্তু এবং কোন মানসিকতা ঘিরে আবর্তিত হয়।জঙ্ঘা শব্দের ভুল অর্থ অধিকাংশ লোকের মতো সুবোধও করেছেন। তাঁর যৌনতার কবিতাগুলোয় জঙ্ঘা শব্দটিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যেন জঙ্ঘা মানে উরুদেশ বা উরুসন্ধি। বইটিতে অন্তমিলের কবিতাই বেশি। নিন্দা কবিতাটিতে পাবে খাবে, ভয় নয়, শোলা ভোলা ইত্যাদি শিশুতোষ মিল দিয়ে হঠাৎ ভেঙের সঙ্গে জেনে। অন্তমিল বজায় রাখতে গিয়ে সোজামিলের সঙ্গে ভুরি ভুরি গোঁজামিলও এসেছে। নিগ্রোর সঙ্গে বিগ্রহ, কমলের সঙ্গে গোল। কাদম্বরী দেবী, আপনাকে কবিতাটিতে সুবোধ কাদম্বরীকে শাড়ি পড়ালেন, টিপ পড়ালেন, অবশেষে তাঁকে তিরস্কারও করছেন আত্মহত্যা করেছেন বলে, রবি

আর জ্যোতিদাদা যত সুন্দর সুন্দর দোষই করুক না কেন, কাদম্বরীর যেন সব মাথা পেতে বরণ করলেই ভালো ছিল। রাগ দেখানো হয়েছে ইবমচা সিং কবিতায়,

মিলিটারি দিয়ে ঢোকানো যায়,/

দেশ চালানো যায় না।/

দরদ দেখানো হয়েছে টালিনালা কবিতায়,

জানি না এবার পুজোয় কোথায় যাব,/

রান্না না হলে জানি না কী করে খাব।/

দেখানো বলছি কারণ এসব কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে না। এসব নিতান্তই লেখার জন্য লেখা। বলার জন্য বলা। কেবল সুবোধ নন, আজকাল অনেক কবিই হিসেবি ব্যবসায়ীর মতো শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে দেন, মঞ্চে মানাবে এমন বাক্য উচ্চারণ করেন। যৌনসঙ্গমের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করা হয়েছে অনেকগুলো কবিতায়, এর মধ্যে আমি তোমার শরীরে কবিতাটিতে কোনও মেয়ের চুলের মুঠি ধরে কিছু করার বাসনা জাগে তাঁর। মণিপুরের মা বইটিতে আসলে বারবারই কিন্তু ভগবানের মতো মিলিটারির মতো পুরুষাঙ্গ ধারণ করা পুরুষ-কবিও হাঁউ মাঁউ খাঁউ বলে দাঁত নখ মেলে ছুটে আসেন ছত্রে ছত্রে। অনেকে বলেন, মোটিভ যেমনই থাক, কবিতা কবিতা হলেই হল। মোটিভ মন্দ হলে কবিতা যে মন্দ হবে না তার তো কোনও কথা নেই। কাব্যনাটক, কাল মহুয়ার বনে, যেটি তিনি উপহার দিয়েছেন পাঠকদের, সেটিও নিতান্তই নিকৃষ্ট।

সুবোধের চেয়ে ঢের ভালো কবিতা লেখেন বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়। তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীটাকে দেখে নিচ্ছেন। তাঁর টুকরো টুকরো দেখা ---

ওই যে মৃত্যু ঝলসে উঠছে নিস্কলঙ্ক ক্ষুরের মতো/তোর গলায় না আমার গলায় বউনি করব? (বলে দে)

সোনামনা, উলের কণা/আজকে রাতটা আমার হও। (ভিখিরি কম্বলকে বলল)

ভাঙো জেলা, ভাঙো প্রদেশ, তার সঙ্গে আমার/লোনলিনেস ভাঙো তো দেখি আধলা ইট ছুড়ে।/(ছুটির কবিতা)

ক্লান্ত লাগলে খুলেও দেবে, শুয়ে পড়বে ধপাস/মড়া যেমন যে কোনও খাটে একাই শুয়ে থাকে!/(একা)

কোনখানে যে কোকিল ডাকে, কোত্থেকে যে রক্ত ডেকে ওঠে!(বসন্তের মুখে)

গঙ্গারাম তো মজুত কিন্তু যমুনাবতী কম,/ বল রাধা বল, হবে, না কি হবে না সঙ্গম?(বল, রাধা বল)

যে যেখানে , দশচক্র, খেয়াল করোনি? দক্ষিণভারত ভ্রমণ, ছাত্র বলল, ছাত্রী লিখছে, মর্জি, রুটিন কবিতাগুলো বড় খাপখোলা, বড় খাঁটি।

বিনায়কের বাইরের পৃথিবীটি একটি আলোকিত মাঠের দিকে নিয়ে যেতে থাকে পাঠককে আর শ্রীজাতর ছোটদের চিড়িয়াখানা এক মাঠ খরার ওপর এক বিকেল বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়।

অনেক দেখা বাকি। তুমি আমায় সবে চিনছ/

আর দিনেরবেলা ঝুটঝামেলা, রাতেরবেলা নীলচোখ./.

তবু দেড়হাজারি মাইনেয় আমি তোমার মন পাইনে/

উল্টে হেসে মাসের শেষে ধার নিয়েছি তিনশো /

চিনবে, ধীরেসুস্থে। /

তুমি চাইলে পুরো পুষতে,/

আমি ওপর ওপর প্রভুভক্ত, ভেতর-ভেতর হিংস্র।/

কিছু প্রেম কিছু বিচ্ছেদ পর্বের ভূমিকাটি আমি অনেকবার পড়েছি। যখন ভালো লাগা আমাকে গ্রাস করে ফেলে, তখন বারবার না পড়ে পারি না। জেনে নেওয়া দরকার, ছেড়ে যাওয়া, তিন দিয়ে গুণ, দুই দিয়ে ভাগ, ওরিজিনাল -------সবই অরিজিনাল, অনবদ্য।

এবার পুজোয় পারলে, সখি, অন্তরে আয়/

শরীর জুড়ে ফুটুক ছাতিম/

আমরা দুজন হাট্টিমাটিম ঝড়ের খেয়ায়/

শ্রীজাতর চিড়িয়াখানায় কুকুর বেড়াল, সাপ, সিংহ, কচ্ছপ, বাদুড়, মুরগি থেকে হায়না পর্যন্ত আছে। মুরগি, বাদুড়, হায়না, কচ্ছপ কবিতাগুলোর কোনও তুলনা হয় না।

বাদুড় প্রসঙ্গে,

সে শুধু শব্দ ছুঁড়ে দেয় আর লুফে নেয়,/

চুপচাপ থাকে। সে শুধু দোষের মধ্যে/

জন্ম থেকেই উল্টো দেখছে দুনিয়া/

হায়না প্রসঙ্গে,

ঘড়ির কাঁটা বাছতে গিয়ে হাতে সময় বিঁধছে/

আঙুলে কেটে, না, রক্ত না, গরম-গরম ইচ্ছে/

গড়িয়ে পড়ছে মেঝের ওপর। চাটতে এসে হায়না/

আমার কাছে থাকতে চাইছে(ফিরিয়ে দেওয়াও যায় না)/

এই হায়না কবির সঙ্গে ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, গল্প করছে, বেঁচে থাকার কায়দাও আদান প্রদান হচ্ছে দুজনের মধ্যে। কবিতাটি কবি শেষ করছেন এভাবে,

যেমন আমি রক্ত চাটা শিখছি, তবে আস্তে/

ওরও একটু সময় লাগবে ঘড়ির কাঁটা বাছতে.../.

ছন্দে বাজে কাব্যের নূপুর। জন্তুগুলো মানুষ হচ্ছে, মানুষগুলো জন্তু। ছোটদের চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার বড়দের মানুষ হতে শেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

মানুষ। উপায় কবিতাটির ধার তলোয়ারকেও কেটে যায়। যখন সমাজের ভুলগুলো হাতে নাতে ধরে ফেলে কেউ প্রশ্ন করতে চায় এ নিয়ে, তখন একটি উপায় বের করা হয়, পরামর্শ দেয় সকলে কানে কানে, বাইরে কোথাও কাটিয়ে এসো হপ্তাখানেক।

অতুলনীয় ছন্দে বেঁধেছেন ভিড় কবিতাটি। বোধে বেঁধেছেন বন্ধুরা বিদেশ চলে গেলে। প্রেমে বেঁধেছেন যদি। যদি শব্দ দিয়ে মারো, জেনো জন্মাব আবার, যদি দুঃখ দাও আরও, হব কপালে ছারখার, যদি সঙ্গে নিতে পারো, আমি সমগ্র তোমার। এমন বাক্য শুনে কে না এই নিখুঁত কবিকে সঙ্গে নিতে চাইবে!